দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... AUG 02 1999 ...
পৃঃ ৫ কলাম ৬ .....

আরও একটি বিশ্ববিদ্যালয়, আরও কিছু প্রশ্ন

ডাঃ তারেক শামসুর রেহমান

আরও একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হল গত ২৪ জুলাই। রংপুরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। এটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় নয়, এটি হবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। এ ধরনের মোট ১২টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে রংপুরের বাইরে দিনাজপুর, গোপালগঞ্জ, পটুয়াখালী, টাঙ্গাইল ও রাঙ্গামাটিতে মোট ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্মিত হবে আরও ছয়টি-বগুড়া, পাবনা, নোয়াখালী, বরিশাল, যশোর ও কুমিল্লায়। উল্লেখ্য, দেশে মোট ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, যা সরকার কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। দেশের জনগোষ্ঠী যেখানে ১৩ কোটি, শিক্ষিতের হার যেখানে ৪৭ দশমিক ৩ (বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট, ১৯৯৫), সেখানে পুরানো ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয় যথেষ্ট নয়। কেননা বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী এসএসসি পর্যায়ে দেশে স্কুলে যাতায়াতকারীর সংখ্যা এখন ২৬ দশমিক ৪ ভাগ (১৯৯৫)। আগামী ২০০০ সালে এই সংখ্যা উন্নীত হবে ৩৬ ভাগে, আর ২০১০ সালে এ সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে ৪৭ দশমিক ৩ ভাগে। স্কুলে যাতায়াতকারীদের পুরোটা অংশই উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তি হতে চাইবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সিট সংকটের কারণে হয়ত অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ পাবে না। এক্ষেত্রে ২০০২ সালের মধ্যে নতুন ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ শেষ হলে দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড় য়া ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা বাড়বে। কিন্তু এতে করে কি সমস্যা আরও বাড়বে না? শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কি এর ফলে বাড়বে না? যেখানে আগামী ২০০০ সালে শতকরা ৫৮ জনের কর্মসংস্থান হবে কৃষি সেক্টরে (বর্তমানে ৬৪), ১৬ জনের হবে শিল্প প্রতিষ্ঠানে, আর ২৬ জনের হবে সার্ভিস বা সেবামূলক সেক্টরে (২০১০ সালের এই পরিসংখ্যান অনেকটা এরকমঃ কৃষি ৪৯ শিল্পে ২০%, সার্ভিস ৩১%), সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা শিক্ষিত গ্রাজুয়েটদের কর্মসংস্থান হবে কোথায়? আজ সাহস করে যে কথাটি বলতে চাই তা হচ্ছে উচ্চশিক্ষা সীমিত হওয়া উচিত। ঢালাওভাবে আমরা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি করছি। ভর্তির জন্য রয়েছে আবার বিভিন্ন কোটা- শিক্ষক কোটা, কর্মচারী কোটা, পাহাড়ী কোটা, খেলোয়াড় কোটা, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কোটা ইত্যাদি। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এ ধরনের কোটা পদ্ধতি কি থাকা উচিত? মুক্তিযোদ্ধারা এ দেশের কৃতী সন্তান। রাষ্ট্র তাদের সম্মান দিয়েছে এবং দেবে। উচ্চশিক্ষার সাথে যেহেতু চাকরির প্রশ্নটি জড়িত, সেক্ষেত্রে সরকার মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যিনি চাকরি করেন, তাঁর সন্তান যদি ভর্তি হতে যোগ্য বলে বিবেচিত না হন, তাহলে কোন্ যুক্তিতে তাদের সন্তানদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হবে? বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছাত্র ভর্তির মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। যেখানে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারছে না, সেখানে কোটা পদ্ধতি বিলোপ করা উচিত। উচ্চশিক্ষার প্রশ্নে পৃথিবীর কোন দেশেই এ ধরনের কোটা পদ্ধতি চালু নেই। এমনকি ভারতেও নেই।

আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এমনই যে এই শিক্ষাব্যবস্থা বেকার ডিগ্রীধারী তৈরী করছে, জ্ঞানী লোক সৃষ্টি করছে না। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষকতা করে দেখেছি ছাত্ররা আজ বেশিমাত্রায় নোটনির্ভর। নোট ছাড়া ছাত্র-ছাত্রীরা অন্য কিছু বোঝে না। আর সেই নোটও বেশ কয়েক বছরের পুরানো। ফটোকপি করতে করতে এখন তা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু তারপরও ফটোকপি হচ্ছে। এবং প্রশ্নে যাই আসুক, ছাত্র-ছাত্রীরা ঐ নোট মুখস্থ করে তা পরীক্ষার খাতায় লিখে দিয়ে আসে। আর শিক্ষক, যিনি ঐ খাতা মূল্যায়ন করেন, তাকে বাধ্য হয়ে নম্বর দিতে হয়। সে সময় তিনি যদি সঠিক মূল্যায়ন করেন, তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা ঐ কোর্সে খারাপ করবে।

উচ্চশিক্ষা পৃথিবীর বহু দেশেই প্রতিযোগিতামূলক এবং সীমিত। আমাদের দেশে আমরা এই উচ্চশিক্ষা উন্মুক্ত করে দিয়েছি। এর ফলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রাজুয়েট ও সার্টিফিকেটধারীদেরকে আমরা প্রতিবছর 'জব মার্কেটে' ঠেলে দিচ্ছি। চাকরির ক্ষেত্র যেখানে সংকুচিত, সেখানে উচ্চ ডিগ্রীধারীরা আজ সাধারণ একটি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। উচ্চশিক্ষা নয়, প্রয়োজন আজ পেশাভিত্তিক শিক্ষা। আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার আলোকে আজ পেশাভিত্তিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। ঢালাওভাবে আজ ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তি করানোর প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। কেননা আমাদের দেশে চাকুরীর বাজার সীমিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে এরা বছরের পর বছর বসে থাকবে চাকরির আশায়। আর চাকরি বলতে এদের সবারই আগ্রহ থাকে সরকারী চাকরি ক্যাডার সার্ভিস। গেল বছর বিসিএস পরীক্ষা দিয়েছিল প্রায় ৮০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী। এবারে এ সংখ্যা ৯০ হাজার অতিক্রম করেছে। চূড়ান্তপর্বে টিকতে পারবে মাত্র ক'জন। বাকীরা কোথায় যাবে? ব্যক্তিগত খাত আমাদের দেশে এখনও বড় নয়। এরা চান দক্ষ কর্মী। রাষ্ট্রবিজ্ঞান কিংবা সমাজ বিজ্ঞানের একজন এমএসএস ডিগ্রীধারীর চাইতে এরা চাইবেন একজন এমবিএ ডিগ্রীধারীকে। এবং সেটাই স্বাভাবিক। আমাদের দেশে এখনও বেশকিছু পেশা রয়েছে, যা সামাজিকভাবে হয়ত স্বীকৃত নয়, কিন্তু এ পেশায় থেকে যে কেউ ভালোভাবে জীবন ধারণ করতে পারেন। সামাজিক মর্যাদার অভাবেই এসব পেশায় মানুষ আকৃষ্ট হচ্ছে না। এসব পেশায় যদি শিক্ষিত শ্রেণী আসে, তাহলে যে ঐসব পেশার গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এমনই যে এই শিক্ষাব্যবস্থা বেকার ডিগ্রীধারী তৈরী করছে, জ্ঞানী লোক সৃষ্টি করছে না। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষকতা করে দেখেছি ছাত্ররা আজ বেশিমাত্রায় নোটনির্ভর। নোট ছাড়া ছাত্র-ছাত্রীরা অন্য কিছু বোঝে না। আর সেই নোটও বেশ কয়েক বছরের পুরানো। ফটোকপি করতে করতে এখন তা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু তারপরও ফটোকপি হচ্ছে। এবং প্রশ্নে যাই আসুক, ছাত্র-ছাত্রীরা ঐ নোট মুখস্থ করে তা পরীক্ষার খাতায় লিখে দিয়ে আসে। আর শিক্ষক, যিনি ঐ খাতা মূল্যায়ন করেন, তাকে বাধ্য হয়ে নম্বর দিতে হয়। সে সময় তিনি যদি সঠিক মূল্যায়ন করেন, তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা ঐ কোর্সে খারাপ করবে। আর খারাপ করলে দোষ পড়বে কোর্স শিক্ষকের। একজন শিক্ষার্থী আজ তাই বিষয়ভিত্তিক কিছু না জেনে-শুনে শুধু নোটনির্ভর হয়ে ডিগ্রী অর্জন করছে। অনার্স পর্যায়ে আজকাল খুব কম ছাত্রই ২য় শ্রেণী পায়। তৃতীয় শ্রেণী দেয়ার রেওয়াজ আজকাল উঠে গেছে। অথচ ১০-১২ বছর আগেও শিক্ষার্থীরা তৃতীয় শ্রেণী পেত। উচ্চ শিক্ষা আজ এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, নোটনির্ভর একজন ছাত্র আজ অনায়াসে দ্বিতীয় শ্রেণী পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সমস্যা হয় তখনই, যখনই সে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। তার সীমিত জ্ঞান তাকে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সাহায্য করে না। ফলে বেকার জীবনের গ্লানি তাকে বইতে হয়। অথচ তাকে যদি একটি পেশাভিত্তিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা যেত, তাহলে তাকে ঐ বেকার জীবনের গ্লানি বইতে হত না। সুতরাং আজ আমাদের অভিভাবকদেরও বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে- তাঁর সন্তানকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়ে দেশে আরও একজন বেকারের সংখ্যা বাড়াতে চান, নাকি পেশাভিত্তিক শিক্ষায় নিয়োজিত করে তাঁর সন্তানকে এই সমাজে ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ দিতে চান? অনেক অভিভাবকের সাথে আলাপ করে দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সন্তানকে ভর্তি করার ব্যাপারটিকে তাঁরা অনেকটা প্রেষ্টিজ ইস্যু মনে করেন। এই মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন।

উচ্চ শিক্ষার প্রশ্নে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন। দেশের সমস্ত কলেজ এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীনে। গ্রামে-গঞ্জে এখন ব্যাঙের ছাতার মত কলেজ তৈরী করা হচ্ছে। শিক্ষক থাক বা না থাক অতিদ্রুত সেখানে অনার্স কোর্স চালু করা হচ্ছে। এমনকি মাষ্টার্স কোর্সও চালু করা হয়েছে কোথাও কোথাও। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনায় কলেজগুলোতে অনার্স কোর্স চালু করা হচ্ছে। স্থানীয় সংসদ সদস্য এসব ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। সংসদ সদস্যরা শিক্ষামন্ত্রী কিংবা সিনিয়র মন্ত্রীকে নিয়ে যান কলেজ ক্যাম্পাসে। বাধ্য করেন অনার্স কোর্স চালু করার ঘোষণা দিতে। কোথাওবা আবার প্রধানমন্ত্রীকেও বাধ্য করেন এ ধরনের ঘোষণা দিতে। কিন্তু ঘোষণা দিলেই কি হয়? তিন বছরের অনার্স কোর্সে পড়াশুনার মত যোগ্য শিক্ষক ঐ কলেজে আছে কিনা, লাইব্রেরীতে উপযুক্ত রেফারেন্স বই আছে কিনা কিংবা ল্যাবরেটরীতে পরিমিত সুযোগ-সুবিধা আছে কিনা, তা কখনই যাচাই করে দেখা হয় না। দেখা গেল একটি কলেজে একটি বিশেষ বিষয়ে মাত্র চারজন শিক্ষক আছেন। এই চারজন শিক্ষক উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ক্লাস নেন, ডিগ্রীতে ক্লাস নেন, আবার তাদেরকে মাষ্টার্সেও ক্লাস নিতে হয়। একজন শিক্ষকের পক্ষে এটি সম্ভব কিনা তা কর্তৃপক্ষ কখনও ভেবে দেখেন না। এখানেও রয়েছে সেই প্রেষ্টিজ ইস্যু এবং স্থানীয় জনগণের একটা পরোক্ষ চাপ। প্রায় ক্ষেত্রেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঐসব কলেজকে অনুমোদন দিয়ে থাকেন। অথচ কলেজগুলোতে আদৌ পড়াশোনা হচ্ছে কিনা কিংবা অনার্স কোর্সে পড়ানোর মত শিক্ষক আছে কিনা, তা একবার ভেবেও দেখেন না। ফলে যা হবার তাই হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা নকল করে। বাজারে পাওয়া তৃতীয় শ্রেণীর নোটবই পড়ে অথবা নকল করে অনার্স সম্পন্ন করে। আর আশ্চর্য ব্যাপার হলেও সত্য, শিক্ষকরা নকলবাজিকে উৎসাহিত করেন। কেননা, ছাত্র যদি পাস না করে তাহলে কলেজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ইতোমধ্যে কলেজগুলোতে অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্স চালু করে আমরা উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বৈষম্যের সৃষ্টি করেছি। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ডিগ্রীকে যেভাবে মূল্য দেয়া হয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ডিগ্রীকে সেভাবে মূল্য দেয়া হয় না। বিশেষ করে চাকরির ক্ষেত্রেই এই বৈষম্য রয়েছে। সমস্যা রয়েছে আরো একটি। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইতোমধ্যে কোন কোন বিষয়ে চার বছরের অনার্স কোর্স চালু হয়েছে। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় চার বৎসরের অনার্স কোর্স চালু করতে পারবে কিনা, সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এর ফলে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য আরো বাড়বে আগামীতে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে যত দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন ততই মঙ্গল। আরো একটি ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে উদ্যোগী হতে হবে বলে আমি মনে করি-আর সেটি হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক রচনা। বাংলা একাডেমীর যে কাজটি করা উচিত ছিল, বাংলা একাডেমী তা পুরোপুরিভাবে করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। বাংলা একাডেমী তরুণ লেখক প্রকল্পে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করলেও সব বিষয়ে পাঠ্যবই রচনা ও প্রকাশ করতে পারেনি। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, নৃ-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে পাঠ্যবই ও রেফারেন্স বই প্রকাশ করা প্রয়োজন। এসব বিষয়ে ভারতীয় বই-এর একটা বড় বাজার সৃষ্টি হয়েছে এখানে। কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতীয় লেখকদের মূল্যায়ন, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সঠিক নয়। কিন্তু শিক্ষার্থীরা তাই পড়ছে। আমার মনে হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি লেখক প্যানেল তৈরী করে পাঠ্যবই রচনার উদ্যোগ নিতে পারেন। মনে রাখতে হবে সাধারণ ন'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৫২ হাজার, সেখানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন শিক্ষার্থীর সংখ্যা কয়েক লক্ষ। এরা নোটবই পড়ে অভ্যস্ত। এদের হাতে যদি পাঠ্যবই তুলে দেয়া যায়, তাহলে তারা নোটবই-এর বদলে ঐ পাঠ্যবই পড়বে- এ বিশ্বাস আমার আছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এমফিল ও পি.এইচ.ডি প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছে। এ ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছে। এটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত কিংবা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোর আওতায় তা সম্ভব কিনা সে ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এমনিতেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কোন শিক্ষকমন্ডলী নেই। বরং কলেজ কো-অর্ডিনেট করে থাকে। অনার্স ও মাষ্টার্স পর্যায়ের পরীক্ষা নেয়াই এদের মূল কাজ। এ ক্ষেত্রে এমফিল বা পিএইচডি কোর্স চালু করতে হলে, তাদেরকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উপর নির্ভর করতে হবে। এই নির্ভরতার কারণে পিএইচডি কোর্স সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে কিনা, সে ব্যাপারে আমি পুরোপুরিভাবে নিশ্চিত নই। এমনিতেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তাদের উপর অর্পিত কাজ নিয়ে বড় ধরনের ঝামেলায় রয়েছে। প্রশাসনিক কাজ সম্পন্ন করতেই হিমশিম খাচ্ছেন তাঁরা। এর উপরে একাডেমিক কাজের ভার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সইতে পারবেতো?

উচ্চ শিক্ষা নিয়ে আমাদের সিরিয়াস চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। আমাদের দেশে কতজন ইঞ্জিনিয়ার দরকার, কতজন ডাক্তার দরকার, বিভিন্ন সেক্টরে কতজন লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে- এসব বিষয় বিবেচনায় এনে পরিকল্পনা তৈরী করা উচিত। দেশে এখন ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। স্থানীয়ভাবে বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করার চাপ রয়েছে সন্দেহ নেই। আমার ভয় দেশে ব্যাপক বিজ্ঞান গ্র্যাজুয়েট কিংবা প্রকৌশলী তৈরী হলে এদের চাকুরির সংস্থান হবে না। কৃষির উপর নির্ভরতা বেড়ে যাবার কারণে আমাদের দেশে দরকার আরও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। আমাদের দেশে দরকার কৃষি প্রকৌশলী, মৎস বিশেষজ্ঞ, পশু বিশেষজ্ঞ। তা না করে আমরা যদি প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী করে দেশের চাহিদার অতিরিক্ত কম্পিউটার বিজ্ঞানী কিংবা প্রকৌশলী তৈরী করি তাহলে তা একটি বড় ধরনের সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করবে। দেশে প্রযুক্তিগত শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা হতে হবে দেশীয় চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণ। প্রকৌশলীর চেয়ে আমাদের প্রয়োজন টেকনিশিয়ান। দক্ষ টেকনিশিয়ান, যা দেশের চাহিদাই শুধু মেটাবে না, বরং মধ্যপ্রাচ্যে কর্মসংস্থানও সৃষ্টি করতে পারে। এই বিষয়গুলো আজ বিবেচনায় আনা উচিত। ❑ **